বিশ্বাসমশাই ঃ

মজুতদারি করে যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল, বিশ্বাসমশাই তাদের প্রতিনিধি। যে সম্পন্ন চাষী এবং মজুতদার; তবে প্রথমেই কুখ্যাত মজুতদার হয়নি। নতুন গাঁয়ে গঙ্গাচরণের জন্য সে পাঠশালা খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে গঙ্গাচরণকে বলেছিল—'আপনারা আমাদের মাথার মণি—আমি আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' সে গঙ্গাচরণের পরিবারের সদস্য সংখ্যা হিসেব করে বলেছিল, মাসে দশ আড়ি ধান—পনের কাটা চাল হলে তার চলে যাবে।

গঙ্গাচরণের প্রতি বিশ্বাসের এই সম্মান প্রদর্শন— সে কি শিক্ষক বলে, না ব্রাহ্মণ বলে? হয়তো ব্রাহ্মণ বলেই। তবে শিক্ষার সমাদর সে করে এবং বিদ্যেও কিছুটা তার পেটে আছে। গঙ্গাচরণ যখন 'ধ্যায়ন্নিত্যং রজতগিরিনিভং' প্রভৃতি বলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এটা কি বলুন তো?' বিশ্বাসমশাই তারিফ করলে; কিন্তু বিনীতভাবে বললে, সে কি করে জানব? চাষী-বাসী গৃহস্থ সে, আংক-আস্ক পর্যন্ত তার বিদ্যে। তারপর শিশুবোধক থেকে 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' প্রভৃতি বলে আত্মগৌরবের হাসি হেসে বললে—'দেখুন, কদ্দিন আগে পড়েচি, ভুলিনি। সব মনে আছে।'

এই বিশ্বাসেরও একটা দুঃখের অতীত আছে। বাড়ি ছিল চিত্রাঙ্গপুর। অল্প বয়সে বাবা মারা যাবার পর নাবালক দুটো ভাই নিয়ে সংসার। জরিপের সময় জমিজমা যা ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো সব নিজের নামে লিখিয়ে নিলে। তারপর ভাগ্যান্বেষণে এই গ্রামে আসা। এখন ধানের জমিজমা করে সম্পন্ন গৃহস্থ। দেবদ্বিজেও তার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। আসন্ন সন্ধ্যায় সন্ধ্যাহ্নিকের নাম করে গঙ্গাচরণ বাড়ি যেতে চাইলে সে বলেছে, জাতে তারা কাপালী বটে, কিন্তু তাদের মেয়েরা স্নান না করে জলটুকু মুখে দেয় না। তার বাড়িতে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক হলে বাড়ি তার পবিত্র হয়ে যাবে।

বিশ্বাসমশাই সংসারের কর্তা হিসেবে স্নেহময় এবং কর্তব্যপরায়ণ। মাসাবধিকাল তার নাতির জ্বর ছাড়ছে না। একটা গাইগরুর গলায় দড়ি আটকে অপমৃত্যু ঘটেছিল। জ্বর না-ছাড়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে। যাইহোক, এর প্রতিকারের জন্য বিশ্বাস গঙ্গাচরণের দ্বারস্থ হল। গঙ্গাচরণ তাকে 'বড় খদ্দের' বিবেচনা করে বেশ মোটা রকমের ফর্দ দিল। টাকা খরচের জন্য তার আপত্তি নেই। সে অনুরোধ করেছে—'যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুরমশাই—যাতে সেরে ওঠে—'

বিশ্বাসের বড় নির্ভরস্থল ছিল তার কৃষিসম্পদ, তার ধানের গোলা। যুদ্ধের দরুণ চালের দুর্মূল্য নিয়ে যখন তার বাড়িতে আলোচনা হচ্ছিল, তখন সে বলেছে—'আমাদের ভাবনা কি? ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবে এর পরে।' কিন্তু দু'গোলা ধানের মালিক হলেও বিশ্বাসের জ্ঞান সেই কুয়োর ব্যাঙের মতই সীমাবদ্ধ। যুদ্ধে জার্মান সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েছে সে জানে; কিন্তু নবদ্বীপ যখন প্রশ্ন তুলেছে, সিঙ্গাপুর কোন্ জেলায়—যশোর, না খুলনায়? বিশ্বাস তখন অক্লেশে বলেছে— যশোরও নয়, খুলনাও নয়; সে হল সমুদ্রের ধারে পুরীর কাছে, বোধহয় মেদিনীপুর জেলায়।

কিন্তু ভৌগোলিক জ্ঞান বিশ্বাসের যতই কম হোক, বৈষয়িক জ্ঞান ছিল টনটনে। চালের মূল্যবৃদ্ধির আঁচ পেতেই আর পাঁচজন মজুতদারের মত সেও তার গোলার ধান সরিয়ে ফেলল। গাঁয়ের লোক গিয়ে তাকে ধানের জন্য আবেদন-নিবেদন করতে যে

বললে—'নিয়ে যাও গোলা থেকে। যা আছে, দু-পাঁচ আড়ি করে এক এক জনের হবে।' গঙ্গাচরণকে সে বললে—'আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্জ হিসেবে ধান আর কি দেবো। পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।' গঙ্গাচরণ বিস্মিত হল। এত বড় বড় গোলা শেষ হল কি করে!

পথে হীরু কাপালী ব্যাপারটা সব ফাঁস করে দিল। বিশ্বাসের চাতুরী গ্রামের লোক সব জেনে গিয়েছিল। তাই কয়েকদিন পরেই কাপালীপাড়ার লোকেরা মিটিং করলে। অধর কাপালী অনুরোধ জানাল, তাদের পাড়াটা তিনি যেন কর্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। পরের বছর তারা সব শোধ করে দেবে। কিন্তু বিশ্বাসমশাই গোলার চাবিটা সকলের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, গোলায় কী আছে তারা গোলা খুলে দেখতে পারে। এতে ক্ষেত্র কাপালী ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, গোলায় ধান নেই তা তারা জানে; ধান লুকোনো হয়ে গেছে। এরপর অধর কাপালীও অনেক কাকুতিমিনতি করে বিশ্বাসের মন গলাতে চাইল। কিন্তু বিশ্বাস অটল। এর ফলও হাতে হাতে ফলল। সেই রাতেই খাওয়ার পর পুকুর-পাড়ে বিশ্বাস আক্রান্ত হল; মাথার যন্ত্রণায় এবং রক্তপাতে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরতেই বিশ্বাস মেয়ে সৌদামিনীকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলে—সব নিয়ে গিয়েচে? মেয়ে বললে—সব ঠিক আছে। বিশ্বাস তখনই সব দেখতে চাইল। কিন্তু মেয়ে বললে, সেরে উঠে দেখতে পাবে। ঘরের আড়ার উপরে, তক্তাপোশের নীচে সমস্ত ধানের বস্তা ঠিক আছে।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ বিশ্বাসকে দেখতে গিয়ে দেখল, বিশ্বাস বিছানায় বসে তামাক খাচ্ছে। তারপর শুনলো, বিশ্বাস এ গ্রাম ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির দেশে চলে যাচ্ছে। রাতারাতি মজুত ধান সব সেখানে পাচার করে দিয়েছে, পথে গরুরগাড়ির চাকার দাগ দেখেই গঙ্গাচরণ সব বুঝেছিল। এ ডাকাতের দেশ থেকে বিশ্বাসমশাই চিরদিনের জন্য চলে গেল।

পেটের জ্বালায় মন্বন্তরের মানুষ বাধ্য হয়ে ডাকাত হয়েছিল। তাই তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু বৈষয়িক বিশ্বাসই কী সম্পূর্ণ অপরাধী? দেশব্যাপী ক্ষুধার যে করাল গ্রাস তা একা বিশ্বাস মিটাবে কি করে? তবে সব মজুতদাররা সমবেতভাবে চেষ্টা করলে সুরাহা হত। কিন্তু সেই মহাকালের ঘটনাপ্রবাহকে প্রতিরোধ করার শক্তি কার কতটা ছিল বলা শক্ত।

আহত হয়ে জ্ঞানলাভের পরেই সে যে চালের বস্তা দেখতে চেয়েছিল, তাতে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। কারণ পুত্র পরিবার নিয়ে এই দুর্ভিক্ষের সময়ে বেঁচে থাকার জন্য ঐ চালগুলি তো তারও সম্বল ছিল। লুঠ হয়ে গেলে তার উপায় কী হত? আসলে বিভূতিভূষণ বিশ্বাসের চরিত্রকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাকে সম্পূর্ণ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বলা যায় না। বাধ্য হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে যেতে না হলে মানুষকে সে কিছুই না দিয়ে বোধ হয় থাকতে পারতো না। অনঙ্গ-বৌয়ের কথায় এর সমর্থন মেলে—'এই বিপদের দিনে তবু ও একটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবু পাওয়া যেত। এবার গাঁয়ের দুর্দশা হবে।' হলও তাই।